১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড, উলটো রথে বাংলাদেশকে চড়িয়ে দেওয়ার নীলনকশা

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের শেষ রাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার পরিবারের সদস্য এবং মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও যুবলীগ প্রধান শেখ মনির পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্যের হত্যাকাণ্ড 'কতিপয় উশৃঙ্খল সেনা কর্মকর্তার' মস্তিস্ক প্রসূত শুধু নির্মম কোনো হত্যাকাণ্ড ছিলো না। দীর্ঘদিন পাঠ্যপুস্তকে কতিপয় উশৃঙ্খল সেনা কর্মকর্তার আক্রোশের বিষয় হিসেবে এটি দেখানো হয়েছিলো। বিএনপি এবং জোট সরকারের শাসনকালে এই হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসেবে ১৯৭৫ সালে এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনা হিসেবে দেখানো হয়েছিলো। ১৫ই আগস্টের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের এসব বিভ্রান্তিকর, অযৌক্তিক এবং মনগড়া কারণ বা উপলক্ষ্য উপস্থাপনের পেছনে ছিলো ক্ষমতা দখলকারী অপশক্তির লক্ষ্য, পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও তাদের পরিচয়কে আড়াল করা এবং নতুন প্রজন্মের দৃষ্টিকে ঘটনাবলির প্রকৃত সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া।

প্রথমত, সেনাবাহিনীর কতিপয় উশৃঙ্খল সেনা কর্মকর্তা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্টকে স্বীয় সিদ্ধান্তবলে হত্যা করতে যাবে এমন দুঃসাহস কতিপয় সেনা সদস্যের থাকে না, এমনটি ঘটে সংগঠিত কোনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দীর্ঘ প্রস্তুতির মাধ্যমে- যেখানে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তর থেকে ট্যাঙ্ক, কামান, অস্ত্র , গুলি বের করা সম্ভব ছিলো। সেটি কতিপয় সাধারণ সেনা সদস্যের পক্ষে ঘটানো কোনোভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু ক্ষমতা দখলকারীরা শিশুদের মস্তিস্কে ১৫ই আগস্টের রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডকে কতিপয় উশৃঙ্খল সেনা সদস্যের কাণ্ড বলে বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলো। সেনাবাহিনীর ভেতরে উশৃঙ্খল সদস্যরা রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করতে পারে এমন প্রশ্নের উত্তরে গোটা সেনাবাহিনীই যে উশৃঙ্খল সেনা সদস্যদের আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা বাহিনীর দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে- সে বিষয়টি ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের সুবিধাভোগী সরকারগুলো মোটেও ভাবেনি। তারা এই হত্যাকাণ্ডের দায় গোটা সেনাবাহিনীর ঘাড়ে দিয়ে তা শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘদিন চালিয়ে গেছে। একাধিক প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ডের এমন শিক্ষা নিয়েই বড়ো হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ঠিক একইভাবে বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত নতুন ধারার রাজনীতির বিপক্ষে সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যেরই বা কেন আক্রোশ ঘটবে , কেনইবা তারা ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মতো নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটাতে যাবে? বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত রাজনীতি রাজনৈতিকভাবেই কেবলমাত্র মীমাংসিত হতে পারে। সেই কাজটি করবেন রাজনীতিবিদরা। কিন্তু দীর্ঘদিন শিক্ষাব্যবস্থায় '৭৫ এর এই হত্যাকাণ্ডের দায় কতিপয় সেনা সদস্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে রাজনীতি, প্রচারমাধ্যম এবং সমাজেব্যবস্থায় যেভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো তাতে এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের নায়ক , ষড়যন্ত্রকারী এবং এর সমর্থকদের পরিচয় ও চেহারাকে আড়াল করা হয়েছিলো। কিন্তু বাস্তবে এই হত্যাকাণ্ড মোটেও কতিপয় সেনা সদস্যের কোনো আক্রোশের বিষয় ছিলো না, কিংবা বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত নতুন রাজনীতিতে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও কোনো কারণ ছিলো না।

বস্তুত, এই হত্যাকাণ্ডটি মোটেও বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং জনগণের কাছে কিংবা জনগণের জন্য অত ছোটো কোন ঘটনা ছিলো না। ১৫ই আগস্টের হত্যাকাণ্ড ছিলো পূর্ব পরিকল্পিত দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শক্তির একটি গভীর ষড়যন্ত্র যার লক্ষ্য ছিলো মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ পরবর্তী সূচিত রাষ্ট্র নির্মাণের যাত্রাকে অংকুরেই বিনষ্ট করে দেওয়া এবং সেই স্থলে বাংলাদেশকে ভাবাদর্শগতভাবে ১৯৭১ পূর্ববর্তী ১৯৪৭ সালের পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত চরিত্রে ফিরিয়ে নেওয়া। সেই পথে ষড়যন্ত্রকারী দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক শক্তির প্রধান বাঁধা ছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতি । কারণ তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্রকে বদলানোর চেষ্টা করেছিলেন ২৩ বছর ধরে । কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানকে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে দিতে চায়নি। সেখান থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৬ দফার স্বাধিকার আন্দোলনকে এক দফায় রূপান্তরিত করার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল মহলের ষড়যন্ত্র , অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তার নেতৃত্বেই '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিলো। পাকিস্তান সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাংলাদেশ ভূখন্ড ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকেও তিনি একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার যে পরিকল্পনা ধাপে ধাপে প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করে চলছিলেন। তাতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল পরাজিত শক্তি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো যে তিনি বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করবেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন তিনি মেহনতি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই রাজনীতিতে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এগিয়ে চলছেন।

যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশকে তিনি ১৯৭২ সালে সাংবিধানিক কাঠামো, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, নতুন জাতি গঠনের শিক্ষাব্যবস্থা এবং জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে যথার্থ অর্থেই একজন রাষ্ট্র নির্মাতার প্রজ্ঞা, দৃষ্টিভঙ্গি, এবং যোগ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর এই পথ চলা সম্পর্কে তার দেশি এবং বিদেশি প্রতিপক্ষ যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ করেই বাংলাদেশকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য যত নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিকতা প্রদর্শন করতে হয় তারা তার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৯৫০, ৬০ এবং ৭০ এর দশকে যেসব রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছিলো তাদেরকে স্বাধীনভাবে বিকশিত না হতে দেওয়ার একটি ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী দেশগুলোর অভ্যন্তরে যেমন ছিলো, আন্তর্জাতিকভাবেও কোনো কোনো শক্তি এদেরকে বুদ্ধি-পরামর্শ, অর্থ, অস্ত্র এবং আশ্রয় দিয়ে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান ঘটানো, সরকার প্রধানকে প্রয়োজনে হত্যার মাধ্যমে হলেও উৎখাত করতে দ্বিধা করেনি। এটি সেই সময়ে এশিয়া এবং আফ্রিকার বেশ কিছু রাষ্ট্রে ঘটেছিলো। এমনকি লাতিন আমেরিকায়ও রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটানো হয়েছিলো। বাংলাদেশেও অনুরূপভাবে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই গোপনে সরকার উৎখাতের নানা প্রস্তুতি দেশে ও দেশের বাইরে চলতে থাকে । নিঃসন্দেহে ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পেরেছিলো বঙ্গবন্ধুর মতো জনপ্রিয় নেতাকে ক্ষমতা থেকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কোনোভাবে উৎখাত করানো যাবে না। সেকারণে তাদের জন্য তখন একমাত্র পথ খোলা ছিলো বঙ্গবন্ধুকে রাতের আঁধারে হত্যা করা ।

সেই হত্যাকাণ্ডে সবচাইতে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র এবং কিছু উচ্চাভিলাষী সৈনিক ও কর্মকর্তা- যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করেনি কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। তাহলেই সেই রকম সৈনিক ও কর্মকর্তাদের দিয়ে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করা যতটা সহজ হবে, অন্যদেরকে দিয়ে তা মোটেও হবে না। এই হিসাবটি ষড়যন্ত্রকারীদের নেপথ্যের পরিকল্পনাকারীরা খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলো। তাছাড়া বঙ্গবন্ধু যেহেতু বঙ্গভবন কিংবা গণভবনে না থেকে নিজের বাসভবনে অনাড়ম্বরভাবে থাকতেন। নিরাপত্তার বিষয়টিও সেখানে খুব সীমিত পর্যায়ে থাকতো তাই রাতের আঁধারে বাসভবনে ঢুকে তাকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা খুব বেশি জটিল কাজ ছিলো না। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ছিলো হত্যা করতে পারে এমন সামরিক অস্ত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি, একইসঙ্গে দুঃসাহস ও নিষ্ঠুরতার মানসিকতাও তাদের থাকতে হবে । বেছে বেছে পরিকল্পনাকারীরা হত্যায় অংশ নিতে পারা তেমন ব্যক্তিদেরকেই নিয়োজিত করে । হত্যাকাণ্ডের পেছনে আরো অনেক বড়ো ধরনের প্রস্তুতি তাদের ছিলো। ট্যাঙ্ক, গোলাবারুদও তারা সুকৌশলে মহড়ার নামে সেনানিবাসের বাইরে বের করে নিয়ে আসতে পেরেছিলো। বোঝাই যাচ্ছে এই চক্রে সেনানিবাসের উর্ধ্বতন কেউ কেউ জড়িত ছিলেন যারা

হত্যাকান্ড সংগঠিত করার অস্ত্রশস্ত্র যোগানে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। এদের পেছনে বিদেশি শক্তির বল তাদেরকে সাহস যুগিয়েছিলো। অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলে দেশ থেকে পালাতেও তাদের কোনো সমস্যা হতো না। অনেক দেশেই তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা ছিলো যা পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে প্রমাণিত হতে থাকে। সুতরাং এই হত্যাকান্ডটি ছিলো একটি বড়ো ধরনের ষড়যন্ত্রের অংশ। যার বিস্তৃতি আজো আমরা জানতে পারিনি । সে কারণে এটিকে এত বছর কতিপয় বিপথগামী উশৃঙ্খল সেনা সদস্যের সংগঠিত ঘটনা হিসেবেই দেখানো হয়েছিলো। এর সঙ্গে খন্দকার মোশতাক এবং কিছু সুবিধাবাদী রাজনীতির মানুষ যুক্ত থাকায় এই হত্যাকান্ডকে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া হিসেবেও দেখানো চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু খন্দকার মোশতাক ছিলো শিখন্ডী , তার ব্যবহারও ছিলো স্বল্পমেয়াদি। ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্যে নেপথ্যের নায়ক ও কুশীলবরা চলে আসতে থাকে। ব্যবহার করা হয় তখন গোটা সেনাবাহিনীকে। এর প্রতিক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ঘটেছে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকান্ড। রক্তাক্ত রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান এবং সেনাবাহিনীর সংযুক্তি কত বেদনাদায়ক ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে তা ১৯৭৫ থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া বহু ঘটনা থেকে জাতি শিক্ষা নিতে পারে।

কিন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট রাতে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের নিকটজনদের হত্যার পর থেকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে গলা টিপে হত্যা করার পরিকল্পনা ষড়যন্ত্রকারীরা বাস্তবে রূপ দিতে থাকে। হত্যা করা হয় জাতীয় চার নেতাকে। বেড়ে ওঠা ত্যাগী রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে আটকে রাখা হয়। গোটা রাজনীতিকে তছনছ করে দেওয়া হয়। ক্ষমতার শীর্ষে বসা সামরিক বাহিনী প্রধান রাষ্ট্র, রাজনীতি ও প্রশাসনের ওপর ছড়ি ঘোরাতে থাকেন। রাষ্ট্রের যা কিছু অর্জন বহু ত্যাগ ও তিতীক্ষার মাধ্যমে ছিলো তাও তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে যারা বিরোধিতা করেছিলো, বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে যারা মেনে নেয়নি, আধুনিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধারণা যাদের কাছে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, রাজনীতিতে যারা ছিলো পরিত্যাজ্য তাদেরকে নিয়েই তিনি গড়ে তুললেন নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম । তার এইসব বুদ্ধি বিবেচনার পেছনে পাকিস্তানের সামরিক শাসনের অভিজ্ঞতা , বিদেশি কিছু কিছু মহলের বুদ্ধি -পরামর্শ এবং সমর্থন নিহিত ছিলো। ধাপে ধাপে তিনি সে পথেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আদর্শকে চূর্ণবিচুর্ণ করতে থাকেন, সংবিধানকে করলেন তিনি কাটাছেঁড়া , সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মধ্যেও। বাংলাদেশ তখন মুক্তিযুদ্ধের কক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে পূর্ববর্তী পাকিস্তান রাষ্ট্রের কক্ষপথেই ফিরে যায়।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা তখন বাক্সবন্দি, অর্থনৈতিক মুক্তি তখন খালকাটা কুমিরের আহারে পরিণত হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবেও গতি এবং পথ হারায়। দেশে সুবিধাবাদ, ধর্মান্ধতা, ইতিহাস বিকৃতি এবং পশ্চাৎপদ চিন্তাধারা তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এমন রাষ্ট্রব্যবস্থায় জিয়াউর রহমানও টিকে থাকতে পারেননি। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তার জীবন নাশ হয়। ওই সময় রাষ্ট্রকে পরিচালিত করার মতো ত্যাগী , যোগ্য ও আদর্শবান নেতৃত্ব ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ পায়নি। ক্ষমতা আবারো চলে যায় সামরিক ছাউনি থেকে আগত কতিপয় উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তার হাতে-যারা '৭৫ এর হত্যাকান্ডের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর ছিলো। সে কারণেই দ্বিতীয় সামরিক শাসনামলেও রাষ্ট্রকে আদর্শগতভাবে আরো দুর্বল করা হলো। এরপর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অসাম্প্রদায়িকতার ধারায় ফিরে যাওয়ার ভিত্তি ততটা পোক্ত থাকেনি। ১৯৯১ এর নির্বাচনে তারই উদাহরণ সৃষ্টি হলো। বাংলাদেশ ক্রমশ সাম্প্রদায়িকতা, সুবিধাবাদ, ধর্মান্ধতা, উগ্র ভারতবিরোধিতা ইত্যাদির আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি , শিক্ষা, সংস্কৃতি কতটা গভীর সংকটে পড়েছে তা ৮০- ৯০ এর দশক থেকে আরো দৃশ্যমান হতে থাকে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশকে মুক্তিযুদ্ধ এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার ধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিলেন। ৫ বছর নিরন্তর সেই উদ্যোগই অব্যহত ছিলো। কিন্তু দেশ এবং বিদেশে ষড়যন্ত্র নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ২০০১ সালের নির্বাচনে সেটিরই প্রকাশ ঘটে। এরপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় স্বাধীনতা বিরোধীদের আরোহণ এবং ৫ বছর দেশে জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতা, অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নয়ন , দুর্নীতি, অপশাসন চরম আকার ধারণ করে। এর বিরুদ্ধে ২০০৬ সালে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়া, ক্ষোভ এবং আন্দোলন তীব্রতর হয়। জোট সরকার যেনতেন নির্বাচনের পায়তারা করে। দেশ তখন জঙ্গিবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কব্জায় আটকে পড়ায় আন্তর্জাতিক মহলও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। নতুন বিশ্ব বাস্তবতায় বাংলাদেশ ভয়ানক এক বিপদজনক পথে চলে যাচ্ছিলো। সেই অবস্থায় ১/১১ সৃষ্টি হয়, ক্ষমতায় অসাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটে। ২ বছর পর ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার রূপকল্প ২০২১, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিদ্যুতায়ন, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ধারায় দেশকে ফিরিয়ে আনার জন্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করে। স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী শক্তিসহ আরো কিছু গোষ্ঠী এর বিপক্ষে দাঁড়ায়। দেশে একদিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের গণজাগরণ, এর বিপরীতে হেফাজতকে নিয়ে জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে।

২০১৪ এর নির্বাচন ভন্ডুল করার চেষ্টা করা হয় । সরকার সেটি ব্যর্থ করে দেয়। বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পণ করেছে, অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। তবে সমাজ চেতনায় সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র এখন মুক্তিযুদ্ধ বনাম সাম্প্রদায়িকতার দ্বন্দ্বে বিভক্ত। ১৯৭৫ সালে এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি, এখন সেই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পদ ও জীবন হরণ করার অপচেষ্টার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশকে আগামী দিনে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় বিকশিত করার অনেক কার্যকর পদক্ষেপ যেমন নিতে হবে, জনসচেতনতাও সেভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। ১৫ই আগস্টের হত্যাকান্ড ঘটিয়ে ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে যে উল্টোরথে চড়িয়ে দিয়েছিলো সেটিকে এখন রথ থেকে পুরোপুরি নামাতে হবে, বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের মূল ধারায় পরিচালিত করতে হবে। এমনটিই হোক ১৫ই আগস্ট পালনে আমাদের অঙ্গীকার।

#

০৮.০৮.২০২২ পিআইডি ফিচার